অসমীয়া জাতিসত্তা এবং আরএসএস-বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদের মিশেলে গত পাঁচ বছর ধরে আসামে যে বিদেশি চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়নের মহাযজ্ঞ চলছে তারই ফলিতরূপ এনআরসি বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (National Register of Citizens)। জীবন-জীবিকার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে আসামে বসবাসকারি প্রত্যেকটি মানুষকে লাইন দিতে হচ্ছে এনআরসি'র দপ্তরে। তাঁরা যে আসামের মানুষ, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে অথবা তারও আগে, বলা চলে যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করছেন তার পুরোনো সরকারি নথিপত্র জোগাড় করতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এখান থেকে সেখানে। রুজি রোজগার, চাকরি-ব্যবসা, চাষবাস, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শিকেয় উঠেছে। গরিব, দিন এনে দিন খাওয়া মানুষগুলোর অবস্থা সবচেয়ে বেদনাদায়ক। শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায়, চিন্তায়-চেতনায় সবচেয়ে অসচেতন মানুষদের তো দুর্দশার অন্ত নেই। এই অথৈ সমুদ্রে পড়ে কখন কোনটা কিভাবে করতে হবে তাঁরা তার কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থাভাবে নিতে পারছেন না ওয়াকিবহাল পরামর্শদাতার সাহায্য। অনেক সময় অসৎ লোকের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন।

তামাম আসামবাসীর একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে একটা সরকারি ছাপ মারা কাগজ জোগাড় করা। তাও সেটা হতে হবে কম করে ৫০ বছরের পুরোনো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা কাগজে কাজ হাসিল হয় না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাগজের জন্য ফের দৌড় শুরু। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে যদিওবা একটা কাগজ জোগাড় করা সম্ভব হয়, সেটা যে গৃহীত হবে তার নিশ্চয়তা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। তুলনামূলকভাবে কম অগ্রসর আসামের মতো একটি রাজ্যে যেখানে বিপুল সংখ্যক গরিব, নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষের বাস, বাসস্থানের শোচনীয় হাল, প্রতিদিনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্রই নিরাপদে রাখতে পারেন না তাঁদের পক্ষে ৫০/৬০ বছরের পুরোনো কাগজপত্র সযত্নে সুরক্ষিত রাখা কিভাবে সম্ভব বলা মুশকিল। তা ছাড়া প্রতি বছর বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় আসামের বিরাট অংশের মানুষ। বন্যার জলে বা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে গেছে অজস্র কাগজপত্র। তা ছাড়া একাধিকবার দাঙ্গার আগুনে বহু মানুষের মৃত্যু, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, ভিটেমাটি ছাড়া হবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে অনেক প্রমাণপত্র। আছেন বহু মানুষ ভূমিহীন। পূর্ব পুরুষের জমিজমা থাকলেও পরবর্তীকালে ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিদের মধ্যে ভাগ হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। দারিদ্র ও অন্যান্য কারণেও অনেক মানুষকে জমি বিক্রি করে দিতে হয়েছে। রুজির প্রয়োজনে অনেককে পৈতৃক ভিটেমাটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। ফলে বহু মানুষ পুরোনো সম্পত্তির কাগজপত্র রেখে দেননি বা রাখার প্রয়োজনবোধ করেননি। অনেক মহিলা আছেন যাঁরা বিবাহসূত্রে প্রতিবেশী বা অন্য রাজ্য থেকে আসামে বসবাস করছেন। আবার জীবিকার প্রয়োজনে অনেক মানুষ অন্য রাজ্য থেকে আসামে এসে বহুকাল ধরে বসবাস করছেন। এইসব মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেননি এইসব পুরোনো কাগজপত্র (সেই সময় যা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল) ভবিষ্যতে কোনো একদিন জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে, সেই কাগজগুলির অভাবে একদিন তাঁরা আত্মপরিচিতি বা অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বেন। তা ছাড়া পঞ্চাশ বছর আগে আসামের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় জন্মের শংসাপত্রের প্রয়োজন কেউ তেমনভাবে অনুভব করতেন না। তেমন সরকারি ব্যবস্থাপনাও ছিল না। শহরাঞ্চল ব্যতীত বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালে শিশুর জন্মের ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। ব্যক্তি পরিচয়ের তথ্যগুলি যে নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন আজকের দিনের মতো কেউ তখন ভাববার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই বেশির ভাগ মানুষের কাছেই তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের কাগজপত্রগুলি ছিল না। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহের কারণে তাঁদের সকলকে আত্মপরিচয় ও নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয় তখন তাঁদের অসহায়তা ও বিপন্নতা অনুমান করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

ষাট, সত্তর কিংবা আশি বছর আগে জন্মের প্রমাণপত্র কোন্ সরকারি দপ্তর থেকে জোগাড় করতে হবে, আদৌ সেখানে তা মিলবে কিনা কেউ জানেন না। তা ছাড়া গরিব সাধারণ মানুষের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বাড়িতেই সন্তানের জন্ম হওয়ায় জন্মের প্রমাণ জোগাড় কার্যত অসম্ভব। এতদিনের পুরোনো কাগজপত্র

কোনো বিদ্যালয়েও সংরক্ষিত থাকা কার্যত অসম্ভব। তেমনি অতীতে জমিজমার কাগজপত্রও আজকের মতো এমন সুবিন্যস্ত ছিল না।

এই অবস্থায় পুরোনো কাগজপত্র জোগাড় করতে মানুষকে দিনের পর দিন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে একটার পর একটা দপ্তরে। কখনও রেশন দপ্তরে, কখনও পঞ্চায়েতে, কখনও হাসপাতালে, কখনও স্কুল-কলেজে। কখনও পড়তে হচ্ছে দালাল চক্রের খপ্পরে। সর্বত্র খরচ হয়ে যাচ্ছে সঞ্চয়ের যাবতীয় অর্থ। অনেকে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হয়েও একটা কাগজ জোগাড় করতে সক্ষম হননি। এমন এক ভয়াবহ নজিরবিহীন মানবিক সঙ্কটের মুখে পড়ে আসামের মানুষ আজ নিরুপায়। রাষ্ট্র চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মপরিচয়হীন, দেশহীন প্রমাণ করে কারান্তরালে নিক্ষেপ করতে চায়।

আসামে নাগরিক পঞ্জি

১৯৭৯ সাল থেকে আসামে শুরু হওয়া হিংসাশ্রয়ী ও প্রাণঘাতী বিদেশি বিতাড়ন তথা ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিতাড়নের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আসু (অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) ও অগপ (আসাম গণপরিষদ)'র চুক্তির সূত্র ধরে চলছে নাগরিক পঞ্জি তৈরির কাজ। চুক্তি অনুযায়ীই ভিত্তিবর্ষ নির্ধারিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। অর্থাৎ ওইদিন পর্যন্ত যাঁরা পূর্বতন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে এসে বসবাস করছে তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তার পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের বিদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

আসাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরের দিনই (১৬ আগস্ট) সংসদে পেশ করা হয় চুক্তির বয়ান। তারপর চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা হয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫। যুক্ত হয় নতুন একটি ধারা ৬এ। এই ধারা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 'বাংলাদেশ' থেকে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত যাঁরা এসে আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাঁরা সকলে ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। তারপর থেকে একটার পর একটা সরকার এলেও কোনো সরকারই এই ধারা প্রয়োগ করে নাগরিক তালিকা তৈরি করেনি বা বিদেশি চিহ্নিতকরণের তাগিদ অনুভব করেনি অথবা নানা কারণে বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। ফলে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ নতুন করে চাগাড় দেবার সুযোগ পেয়েছে। বাস্তবের মাটিতে তথাকথিত বিদেশি বা বাংলাদেশি নাম করে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নতুন করে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু

হয়ে যায়। নানাভাবে তাঁদের ওপর আক্রমণ, নির্যাতন, অপমান, হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন চলতে শুরু করে। দীর্ঘ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে দলে দলে অনুপ্রবেশ হচ্ছে বলে জিগির তোলা হয়। এই ধরনের প্রচার ও গুজব ছড়ানোর ফলে একটা ধারণা দানা বাঁধতে থাকে যে সত্যিই বোধ হয় লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি আসামে ঢুকে পড়ে অসমীয়াদের সংখ্যালঘু করে দিচ্ছে। এরই পাশাপাশি নানা মহলে অনুপ্রবেশকারী বিদেশির নানা মনগড়া সংখ্যা হাজির করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

এমন এক পরিস্থিতিতে সামাজিক পরিসরে অসমীয়া ও অঅসমীয়া বিভাজন প্রসারিত হতে থাকে। একটার পর একটা ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনা এই বিভাজনে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করে। তাতে সমাজজীবনে সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা অবস্থা আরও তীব্র হয়। জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়। সংখ্যালঘুদের জন্য একটা স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র জরুরি হয়ে পড়ে। তা না হলে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সহ নানা সুযোগ সুবিধা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজ্যের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চকে ভিত্তি করে সাধারণভাবে এনআরসি সমর্থন করলেও এক্ষেত্রে অত্যুৎসায়ী অসমীয়া জাতিসত্তা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন আসু এবং অগপ। কিঞ্চিৎ ভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থে বেশি উৎসাহী বিজেপি। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তি এনআরসি চায় স্বচ্ছ ও বৈধ নাগরিকত্বের ভিত্তিতে ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে অসমীয়া ও অনসমীয়া মানুষের মধ্যে সংহতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। অসমীয়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তি চায় আসামকে অঅসমীয়ামুক্ত করে নির্ভেজাল অসমীয়াদের বাসভূমি বানাতে। আর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়ন করে হিন্দু আসাম গঠন করতে চায় বৃহত্তর হিন্দু ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে। ফলে এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আসামের জন্য সময়োপযোগী এনআরসি করতে রাজি হলেও নানা কারণে ও অজুহাতে বার বার সেই উদ্যোগ স্থগিত হয়ে যায়। অবশেষে গুয়াহাটি ভিত্তিক অসমীয়া জাতিসত্তাঘেঁষা একটি সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। সেই মামলার রায় অনুসারে ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে আসামে শুরু হয় এনআরসি।

২০০৩ সালের অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ভারতের অন্যত্র বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিক পঞ্জি তৈরির ব্যবস্থা হলেও আসামের ক্ষেত্রে সেটা হবে আবেদনের ভিত্তিতে। অর্থাৎ নাগরিক পঞ্জিতে নাম

নথিভুক্ত করার জন্য আসামে বসবাসকারী সকল ভারতীয়কে আবেদন জানাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে ২০১৫ সালে শুরু হয় আবেদনপত্র সংগ্রহ করার কাজ। ৩১ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৬০টি আবেদন পত্রের মাধ্যমে মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬১ জনের আবেদন জমা পড়ে। প্রমাণপত্র হিসেবে আবেদনের সঙ্গে ১৫টি নথি গ্রহণযোগ্য বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে আসামে বা ভারতের অন্য কোথাও আবেদনকারীর পূর্বপুরুষের বসবাসের প্রমাণ হাজির করতে হবে আবেদনকারীকে। পাশাপাশি পরিবারগুলিকে তাদের বংশলতিকাও জমা দিতে বলা হয়েছে। যেখানেই অমিল দেখা গেছে সেখানেই শুনানির ব্যবস্থা। এই পর্বে গরিব ও নিরক্ষর বিবাহিত মহিলারা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন তাঁদের বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের প্রমাণ হাজির করতে গিয়ে। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণপত্র বলে ঘোষিত হলেও সেটা জোগাড় করার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতা দেখা দেয়।

চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই। তাতে বাদ যায় ৪০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৪৮ জনের নাম। অর্থাৎ মোট আবেদনকারীর ১২.২৪ শতাংশ। চূড়ান্ত খসড়ায় বাতিলদের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৩০ জন ফের আবেদন করেন নাম তোলার জন্য। পাশাপাশি যাঁদের নাম তালিকায় আছে তাঁদের এক লক্ষ ২ হাজার ৪৬২ জনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে আবেদন জমা পড়ে। এরই মধ্যে এনআরসি'র রাজ্য কো-অর্ডিনেটর বিস্ময়করভাবে ঘোষিত ১৫টি গ্রহণযোগ্য প্রমাণের মধ্যে ৫টিকে বাতিল করার প্রস্তাব দেন। কো-অর্ডিনেটরের এই প্রস্তাব নানা মহলে সন্দেহের উদ্রেক করে। অনেকের ধারণা বাতিলের সংখ্যা প্রত্যাশামতো না হওয়ায় সম্ভবত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাসক দল তথা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও অসমীয়া জাতীয়তাবাদীদের চাপে এমন প্রস্তাব তোলা হয়েছে। ১৫টি গ্রহণযোগ্য প্রমাণের মধ্যে ৫টি বাদ গেলে এনআরসি'তে বাদ যাওয়াদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরও বেশ কয়েক লক্ষ বেড়ে যাবে অথবা বাতিলদের পক্ষে নতুন করে নথি জমা দিয়ে নাম তোলা অসম্ভব হয়ে যাবে। বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করেনি।

এই পর্বে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রকরণ (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) নির্ধারণ করতে বলে। কিন্তু মোদী সরকার এই মর্মে কোনো রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না করে নিজেদের মতো করে পদ্ধতি ঠিক করে। সিপিআই(এম) আসাম রাজ্য

কমিটি তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে কিছু প্রস্তাব পাঠায় বিবেচনার জন্য। তার অন্যতম দুটি হল: (১) যতক্ষণ না পর্যন্ত এনআরসি প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে 'ডি' ভোটারদের মামলা স্থগিত রাখা হোক। এনআরসি প্রক্রিয়ায় অন্যান্যদের মতো 'ডি' ভোটারদের মধ্যে যাঁরা প্রমাণপত্র জমা দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হবেন তাঁরা নাগরিক পঞ্জিতে যুক্ত হবেন। বাকি 'ডি' ভোটারদের বিষয়টিই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে বিবেচিত হোক। (২) বংশলতিকার ভিত্তিতে মহিলা ও শিশুদের নাম এনআরসি'তে যুক্ত করা হোক। লেগাসি প্রমাণের জন্য সরকারি ব্যয়ে প্রয়োজনে DNA পরীক্ষার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু মোদী সরকার এর কোনোটাকেই বিবেচনার মধ্যে আনেনি। 'ডি' ভোটারদের পুরোপুরি এনআরসি প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়েছে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে মামলার মধ্য দিয়ে যদি কোনো 'ডি' ভোটার নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে প্রমাণ করতে পারেন তবেই জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে তাঁর নাম নথিভুক্ত হবে। নচেৎ বিদেশি বলে চিহ্নিত হবেন।

চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বাদ যাওয়াদের পুনরাবেদনের শুনানি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। নিজের বাড়ি থেকে বহু দূরে, এমনকি ১০০-১৫০ কিমি দূরে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। তাও আবার একবার দুবার নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার-পাঁচ বারও শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। গ্রামের গরিব কৃষকের পক্ষে এত দূরে এতবার যাতায়াতের অর্থ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। অথচ তাঁরা নিরুপায়। বিশেষ করে যাঁদের নামের বিরুদ্ধে আপত্তি জমা পড়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে হয়রানি হয়েছে চূড়ান্তরূপে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাঁরা আপত্তি করেছে তাঁরা শুনানিতে হাজির হননি। বার বার শুনানির দিন ঠিক হলেও আপত্তিকারীর গরহাজিরায় শুনানি বাতিল হয়েছে। এক্ষেত্রেও গরিব ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও অসমীয়া জাতীয়তাবাদীদের যোগসাজসে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে বলেই সন্দেহ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় দেবজিৎ গোস্বামী নামে জনৈক আপত্তিকারীর কথা। (সূত্র: 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকার ১৩ জুলাই ২০১৯ সংখ্যা) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটি অত্যন্ত প্রান্তিক গ্রাম ঘোড়ইমারি। এই গ্রামেই জন্ম হয় ৯৩ বছরের বৃদ্ধ সামাস উদ্দীনের। বাল্যকালের দেখা এই গ্রামের ছবি ও কথা এখনও তিনি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন। এনআরসি প্রক্রিয়ায় যতগুলি খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সবকটিতেই তাঁর নাম ছিল। কিন্তু গত মার্চ মাসে জনৈক দেবজিৎ গোস্বামী

তার নামে আপত্তি জানান। এই গোস্বামী সামাস উদ্দীনের পরিচিত কেউ নন। গ্রামের অন্য কেউও তাঁর হদিস জানেন না। স্থানীয় একটি এনজিও'র কর্মীরা গোস্বামীর প্রদত্ত ঠিকানায় বার বার গিয়েও তার কোনো খোঁজ পাননি। অথচ এই গোস্বামীর আপত্তির কারণে নিজের গ্রাম থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে দুদিন দুটো শহরে এই বৃদ্ধ সামাস উদ্দীনের ডাক পড়ে। সামাস উদ্দীন বহু কষ্ট স্বীকার করে শুনানিতে হাজির হলেও সেই গোস্বামীর পাত্তা মেলেনি। 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকা আরও জানাচ্ছে, এই জেলায় অসমীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী কোনোভাবে স্থানীয় এনআরসি ডেটা বেসে ঢুকে পড়ে এরকম ৩০ হাজার আপত্তি জমা দিয়েছে। সারা রাজ্যে এমন ২ লক্ষ ২০ হাজার 'বিষাক্ত' চিঠি আপত্তি আকারে জমা পড়েছে গত মে মাসের মধ্যে।

গত ২৬ জুন ২০১৯ এনআরসি কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৬২টি নামের তালিকা প্রকাশ করে মূল খসড়া থেকে তাদের বাদ দেয়। কারণ এরা সকলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'ডি' ভোটার হিসেবে চিহ্নিত, ঘোষিত বিদেশি এবং ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে এদের নাগরিকত্বের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

'ডি' ভোটার ও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল

আসামে এনআরসি প্রক্রিয়া শুরু হবার বহু আগে থেকেই বিদেশি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল নির্বাচন কমিশন। ১৯৯৬-৯৭ সালে চালু করে 'ডি' ভোটার ব্যবস্থা। নির্বাচন কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে তারা সন্দেহজনক ভোটারদের একটি তালিকা তৈরি করেছে। এই তালিকার লোকদের ভোটার তালিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে 'ডি' ভোটার হিসেবে। তালিকায় ওই নামগুলির পাশে থাকে ইংরাজি 'ডি' চিহ্ন। 'ডি' ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও তাঁদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন আরও জানায় 'ডি' ভোটাররা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে গিয়ে তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারলে 'ডি' থেকে তারা মুক্ত হবে এবং ভোটদানের অধিকার ফিরে পাবেন।

ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল একটি আধা বিচার বিভাগীয় সংস্থা। কোনো ব্যক্তি ভারতীয় না বিদেশি তারই বিচার হয় এখানে। ১৯৮৩ সাল থেকে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী (ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক চিহ্নিতকরণ) আইন ১৯৮৩' অনুসরণ করা হত। এই আইন অনুযায়ী কোনো ভোটারের বিরুদ্ধে আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে অভিযোগকারীকেই অভিযোগ প্রমাণ করতে হত। পরে সুপ্রিম কোর্টের এক

রায়ের ফলে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল অনুসরণ করছে 'ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬' আইন। ২০০৫ সাল থেকে তাই অভিযুক্তকেই তাঁর নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হচ্ছে।

বর্তমানে আসামে ৩০০টি ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল আছে। এনআর সি'তে বাদ যাওয়া ২১ লক্ষ মানুষের আবেদন বিবেচনার জন্য আরও ২০০টি ট্রাইব্যুনাল করার কথা ঘোষণা করে সরকার।

ডিটেনশন সেন্টার

সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে আসামে এনআরসি'র কাজ চলছে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের উন্নয়ন ও জনপরিষেবার কাজ কার্যত শিকেয় তুলে ৫২ হাজার কর্মীকে যুক্ত করা হয়েছে এই কাজে। নিয়োগ করা হয়েছে সাত হাজার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার নথিপত্র তারা যাচাই করেছে। সারা দেশে এ কাজ করতে হলে আনুমানিক এক লক্ষ কোটি টাকা বা তারও বেশি খরচ হতে পারে। অর্থনীতির এই দুরবস্থার সময় সরকারি কোষাগারের এত বিপুল অর্থ অপচয় করে এনআরসি'র মহাযজ্ঞ দায়িত্বজ্ঞানহীন বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসাম থেকে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তাড়ানোর এটা নতুন পরিকল্পিত উদ্যোগ হলেও গোটা দেশে তা প্রধানত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। অতীতে অস্ত্র দেখিয়ে আসাম থেকে বিদেশি তকমা দিয়ে সংখ্যালঘুদের তাড়ানো হয়েছিল। এবার সরকারিভাবে কাগজে নাম না তুলে তা করা হচ্ছে।

আসামে নাগরিকত্বের জন্য মোট আবেদন জমা পড়ে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬১ জনের। ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই প্রকাশিত প্রথম খসড়ায় নাম ওঠে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৭৭ জনের। খসড়া তালিকায় বাদ যায় ৪০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৪ জনের নাম। চূড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৮ জনের। চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ে ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জন। অর্থাৎ এদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অমিত শাহ এঁদের উইপোকা বলে উল্লেখ করেছেন। দেশের মোট জনসংখ্যা ১৩৩ কোটি। সেই তুলনায় বিচার করলে বাদ যাওয়াদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবে আসামের মোট জনসংখ্যা ৩.৩ কোটির সঙ্গে তুলনা করলে সংখ্যাটা কম নয়, ৫.৭ শতাংশ। মনে রাখা দরকার গোয়া, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম অথবা সিকিম – এই চার রাজ্যের যে কোনোটির জনসংখ্যা এই বাদ যাওয়া সংখ্যা থেকে কম। অর্থাৎ ভারতের একাধিক ছোট

রাজ্যের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি মানুষকে এক লহমায় বিদেশি বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে আসামে। বাদ যাওয়া ১৯ লক্ষের মধ্যে ৩.৭৪ লক্ষ প্রথম খসড়ায় বাদ যাবার পর দ্বিতীয়বার আবেদনই করেননি। তা ছাড়া 'ডি' ভোটার, 'ডি' ভোটারদের পরিবার, ইতিমধ্যে ঘোষিত বিদেশি এবং ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে বিবেচনাধীনদের মিলিয়ে আছে আনুমানিক ২.৫ লক্ষ। এঁরা সবাই এনআরসি তালিকার বাইরে।

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বাদ যাওয়া মানুষেরা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে নতুন করে প্রমাণপত্র নিয়ে আবেদন করতে পারবে। তার জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর থেকে ১২০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার আগে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কেন নাম বাদ গেছে তার কারণ সংক্রান্ত শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল সেই শংসাপত্র বিবেচনা করে এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে তা শুনানিযোগ্য। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই জায়গাতেই একটা বড় অংশকে ছেঁটে ফেলা হবে। যাঁরা শেষ পর্যন্ত শুনানি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তাঁদেরই শুনানি হবে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে মামলার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বাদ পড়াদের বেশিরভাগই অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁদের পক্ষে বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ট্রাইব্যুনালে লড়াই করা খুবই কঠিন।

অবশ্য আইন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালই শেষ কথা নয়। ট্রাইব্যুনালের পর গৌহাটি হাইকোর্টে আবেদন করার সুযোগ আছে। হাইকোর্টের রায়ের পর সুপ্রিম কোর্টে যাবার সুযোগও আছে। কিন্তু সেই সামর্থ্য বাদ পড়া গরিবদের নেই বললেই চলে। সমস্ত আইনি ও বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া শেষে যাঁরা জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে জায়গা পাবেন না তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা হবে ডিটেনশন সেন্টার। ইতোমধ্যে ৬টি জেলের ভেতর আসাম সরকার ৬টি ডিটেনশন সেন্টার চালু করেছে। তার প্রত্যেকটিতে এক হাজার জন করে থাকতে পারে। এ ছাড়া আসাম সরকার অনুরূপ আরও ১০টি ডিটেনশন সেন্টার বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় দেশের প্রথম স্বতন্ত্র ডিটেনশন সেন্টার নির্মাণ করছে। ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান এই সেন্টারে ৩ হাজার 'বিদেশির' থাকার ব্যবস্থা হবে। এটি নির্মাণে প্রতিদিন ৫০০ শ্রমিক কাজ করছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই শ্রমিকদের অধিকাংশেরই নাম নেই নাগরিক পঞ্জিতে। মহারাষ্ট্র সরকারও একটি ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুরূপ সেন্টার বানাবার জন্য সব রাজ্যকে নির্দেশ পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত বর্তমানে ডিটেনশন কেন্দ্রগুলিতে মোট এক

হাজার ১৪৫ জন 'বিদেশি'কে বন্দি রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য ১৯৬৪ সাল থেকে মার্চ '১৯ পর্যন্ত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল মোট এক লক্ষ ১৭ হাজার ১৬৪ জনকে বিদেশি চিহ্নিত করেছে। তাদের ২৯ হাজার ৮৫৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাকিরা কে কোথায় কিভাবে আছে সরকারি তরফে তার কোনো তথ্য নেই।

বর্তমানে ৩০০টি ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল চালু আছে। সরকার আরও ২০০টি চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। মোট ৫০০টি ট্রাইব্যুনালে ১৯ লক্ষ বিদেশির নাগরিকত্ব কিভাবে ১২০ দিনে বিচার হবে বলা মুশকিল। তার মধ্যে আবার এক মাস চলে যাবে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্কিপিং পেপার জোগাড় করতে। স্কিপিং পেপার ছাড়া ট্রাইব্যুনালে যাওয়া যাবে না। খবরে প্রকাশ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এক মাস কেটে গেলেও কেউ স্কিপিং পেপার হাতে পাননি। স্কিপিং পেপার হল কি কারণে নাম বাদ গেছে তার সরকারি কাগজ। বাদ পড়ার কারণ জানার পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড়ে তাঁদের যেতে হবে ট্রাইব্যুনালে। কার্যত ৭০/৮০ দিনের মধ্যে ১৯ লক্ষ মানুষের আবেদন বিচার ও শুনানি করতে হবে। এটা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। তাই আশঙ্কা সঠিক বিচার ও বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে। তা ছাড়া যেভাবে হিন্দুত্ববাদী তথা আরএসএস সমর্থকদের ট্রাইব্যুনাল সদস্য করা হয়েছে তাতে পাইকারি হারে বিদেশি ঘোষণা হবে বলে অনেকের সন্দেহ।

মনগড়া সংখ্যা

আসামে চূড়ান্ত নাগরিক পঞ্জি প্রকাশের পর এনআরসি'র দাবিদাররা কার্যত হতাশ। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এর ফলে অন্তত ৫০ লক্ষের নাম বাদ যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ১৯ লক্ষ হওয়ায় তাঁদের হতাশ হবারই কথা। এই ফলাফলে অসমীয়া জাতিসত্তার সমর্থকরা যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তেমনি আরএসএস-বিজেপি'র আসাম শাখাও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। পরিস্থিতি জটিল বুঝে সতর্ক হয়ে কথা বলছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। বাদ যাওয়াদের ধর্মীয় ও ভাষা পরিচয়ের আলাদা তথ্য এনআরসি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেনি। তথাপি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর এবং বিভিন্ন সংগঠনের অভিযোগ থেকে জানা যায় বাদ যাওয়াদের মধ্যে বেশিটাই সংখ্যাগুরু বাংলাভাষী হিন্দু। সেই তুলনায় মুসলিম কম। অথচ বিজেপি'র লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের নাম বাদ দেবার। অসমীয়া জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই বাদ দেওয়া।

আসামে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী অগপ এবং আসু রাজ্য সরকারে বিজেপি'র

শরিক হলেও বিদেশি বিতাড়নে তাদের অবস্থান ভিন্ন। আসু-অগপ চায় হিন্দু মুসলিম মিলিয়ে কম করে ৫০ লক্ষকে তাড়াতে। আর বিজেপি চায় শুধু মুসলিমদের তাড়াতে। তাই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কেন্দ্র এনআরসি'কে স্বচ্ছ ও বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবৃতি দিলেও আসাম বিজেপি বলেছে এটা ভুলে ভরা। বেআইনি বাংলাদেশিদের নাম যুক্ত হয়েছে আর প্রকৃত ভারতীয়দের নাম বাদ গেছে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যাঁদের নাম বাদ গেছে আপাতত তাঁদের কোনো অধিকারই কাড়া হবে না। কাউকে আটকও করা হবে না। যে যেমন অধিকার ভোগ করছেন তেমনই করবেন। তাঁরা দেশহীনও হচ্ছেন না। অগপ এবং আসু'ও অখুশি। বিজেপি'র সুরেই কথা বলছে। কেউ আবার সুপ্রিম কোর্টে পুনর্যাচাইয়ের আবেদনের কথা বলছে।

প্রকাশ্যে বিবৃতি যাই হোক আসাম এনআরসি যে তার উদ্যোক্তাদের বেকায়দায় ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। এদের হতাশ হবার পেছনে মূল কারণ ভিত্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা। দেশে বা আসামে বসবাসকারী বিদেশি বা বাংলাদেশিদের সংখ্যা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সমীক্ষা বা ডেটা সংগ্রহ হয়নি। শুধু অনুমানের ভিত্তিতে এতদিন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তথ্য দেখানো হয়েছে।

১৯৬৮ সালে আসাম বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার বিবৃতি ছিল বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের ফলে বেআইনি অনুপ্রবেশের পরিমাণ যৎসামান্য হয়ে পড়েছে। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহও অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী আসাম বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন আসামে বসবাস করে এমন বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। তিনদিন পর অবশ্য তিনি বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সংসদকে জানান গোটা দেশে বিদেশির সংখ্যা এক কোটি। ১৯৯৮ সালে আসামের রাজ্যপাল শ্রীনিবাস কুমার সিংহ রাষ্ট্রপতি নারায়ণনকে রিপোর্ট দিয়ে জানান আসামে নাকি প্রতিদিন ৬ হাজার করে বিদেশির অনুপ্রবেশ ঘটছে। কোথা থেকে তিনি এই তথ্য জোগাড় করেছেন আজও তার হদিশ মেলেনি। লক্ষ্যণীয় ২০১৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যপালের এই রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৪ সালে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জয়সওয়াল রাজ্যসভায় জানান, শুধু আসামেই ৫০ লক্ষ বিদেশি আছে। সারা দেশে এই সংখ্যা এক কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন। ২০০৯ সালে আসাম পাবলিক ওয়ার্কস নামে একটি এনজিও (এরা সুপ্রিম কোর্টে এনআরসি রিভিশনের জন্য মামলা করে) তাদের

জনস্বার্থ মামলার উল্লেখ করে আসামের ভোটার তালিকায় ৪১ লক্ষ বাংলাদেশির নাম আছে। ৪১ লক্ষ ভোটার মানে তাদের পরিবার নিয়ে ৬০/৭০লক্ষ মানুষ। নির্বাচন কমিশন আদালতে এই সংখ্যার বিরোধিতা করেনি। ২০১৬ সালে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজেনু রাজ্যসভায় জানান দেশে মোট ২ কোটি বাংলাদেশি আছে। পরের বছর লোকসভায় কিরেন রিজেনু লিখিত উত্তরে জানান দেশে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঠিক সংখ্যা সরকারের জানা নেই।

উপরের তথ্য থেকে পরিষ্কার ভারতে বিদেশি তথা বাংলাদেশিদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রকৃত কোনো তথ্য নেই। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক স্বার্থে মনগড়া তথ্য হাজির করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বিদেশি তথা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়িয়ে দেখিয়ে বিদেশি তথা বাংলাদেশি এবং মুসলিম বিতাড়নের রাজনীতিকে পুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। বাস্তবে এনআরসি করে যখন দেখা যাচ্ছে পুরোনো ধারনার সঙ্গে তা মিলছে না তখন অসন্তোষ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও বিজেপি তাদের বিদেশি তথা বাংলাদেশি মুসলিম তাড়ানোর অভিযান থেকে সরছে না। কারণ এটা তাদের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ। তবে কিছুটা সতর্ক হবার ও তাড়াহুড়ো না করার কৌশল নিয়েছে। অমিত শাহ বার্তা দিয়েছেন সারা দেশেই এনআরসি হবে। তবে তার আগে নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করা হবে যাতে ভিন দেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা যায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আসামে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন এবং সেই সূত্র ধরে আজকের এনআরসি'র দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। মূলত অসমীয়া জাতিসত্তাকে ঘিরে এই আন্দোলন দানা বাঁধলেও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তার অন্য অভিমুখও ছিল। অসমীয়া আবেগ ও অস্থিরতাকে ব্যবহার করেছে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বৃহত্তর পরিকল্পনা রূপায়ণের স্বার্থে। বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের নেতাদের মতে অসমীয়া জাতিসত্তার সুরক্ষার স্বার্থে আসামের অঅসমীয়া জনসাধারণের একটা বড় অংশকে আসাম থেকে তাড়াতে হবে। তা না হলে অসমীয়াদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু ভারতের সংহতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এই ভাবনার বিরোধী। বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহু সাংস্কৃতিক ভারতের নাগরিকত্ব এক ও অভিন্ন। ভারতের যেকোনো নাগরিক দেশের যেকোনো রাজ্যে বা অঞ্চলে বসবাসের পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। বিশেষ কারণে দুই একটি ক্ষেত্রে

ব্যতিক্রম হলেও ভারতের কোনো রাজ্য একই ভাষা ও সংস্কৃতির বা একই জাতির মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে না। তাই যে দাবিকে কেন্দ্র করে আসাম আন্দোলনের প্রকাশ তা কোনোভাবেই বৈধতা পেতে পারে না। অবশ্য অসমীয়া জাতিসত্তাকে ঘিরে যে আবেগ ও উদ্বেগ তাকেও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বহুজাতিক ভারতের চরিত্রকে বজায় রেখেই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। বাস্তবে সেই পথ পরিত্যাগ করে আন্দোলনকে ঠেলে দেওয়া হয় বিচ্ছিন্নতার দিকে, হিংসার দিকে। আর তারই পরিণতি ১৯৭৯ সালের ভয়াবহ জাতি দাঙ্গা। বিদেশি বিতাড়নই অসমীয়া জাতিসত্তার সুরক্ষার একমাত্র পথ, এই বদ্ধমূল ধারণা আন্দোলনকারীদের সার্বিকভাবে গ্রাস করে ফেলায় বারে বারে আন্দোলনে বিদ্বেষ ও হিংসার প্রাবল্য বেড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী, সবচেয়ে প্রাণঘাতী সশস্ত্র হিংস্র আন্দোলন হয় ১৯৭০'র দশকের শেষে। হিংসার উন্মত্ততায় আর অমানবিক পৈশাচিকতায় খুন করা হয়েছে হাজার হাজার নিরীহ শিশু ও মহিলাকে। কয়েক লক্ষ মানুষের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছেন তাঁরা। মানুষ যাতে আর ফিরে আসতে না পারে তার জন্য ধান চাল, কৃষির সরঞ্জাম, গোরু-মোষ ইত্যাদি হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা লুঠ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আসামের বুকে এমন বীভৎস নারকীয় একতরফা জাতিদাঙ্গার ঘটনা আগে পরে কোনোদিন ঘটেনি।

আসামে অসমীয়া জাতিসত্তা একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। বহিরাগতরা আসামে এসে তাঁদের সংখ্যালঘু করে দেবে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে, অসমীয়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হবে, এমন এক ভীতি ও আশঙ্কা বহু বছর ধরে তৈরি হয়েছে। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশরা অসমীয়াভাষী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বাংলাভাষী সুরমা উপত্যকা নিয়ে আসাম রাজ্য গঠন করে। সেই মিশ্র জাতির অখণ্ড আসামে অসমীয়ারা ছিল সংখ্যালঘু। তা ছাড়া ব্রিটিশ শিল্পপতিদের মুনাফার স্বার্থে চা বাগানে কাজ করার জন্য আনা হয় কয়েক লক্ষ আদিবাসী শ্রমিক। তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে জলাজমি ও পতিত জমিতে পাট চাষ করার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে আনা হয় কয়েক লক্ষ মুসলিম চাষি। এইভাবে ব্রিটিশ আমলেই আসামের জনসংখ্যার চরিত্র বদলে যায়। তা ছাড়া প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর কালে প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতা হওয়ায় সরকারি ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বহু বাঙালি হিন্দুকে আসামে যেতে হয়। শিক্ষাগত ও অন্যান্য কারণে এগিয়ে থাকার ফলে রেল, টেলিকম সহ বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে বাংলাভাষীদের

নিয়োগ হত উল্লেখযোগ্যভাবে। ফলে আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক স্তরে বাঙালিদের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় ছিল না। এই বাস্তবতাও অসমীয়াদের মধ্যে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অসীময়া-অঅসমীয়া বিরোধী-বিদ্বেষের এই অনুর্বর জমিকে পুষ্টি জোগাতে আসরে নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বুনে তারা আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার চেষ্টা করে। তার শিকার হয় আসামের সাধারণ মানুষ। আসামের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার পেছনেও এই বিরোধ-অশান্তি-বিভ্রান্তি অন্যতম কারণ। স্বাধীন ভারতের বিকাশের মূলস্রোত থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অসমীয়া জাতিসত্তাকে উসকে দেয় এবং ঠেলে দেয় বিচ্ছিন্নতার দিকে।

বিদেশি সমস্যা সমাধানের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বটি অবশ্য অসীময়া জাতিসত্তাবাদীদের নিজস্ব আবিষ্কার নয়। তাদের সামনে এই তত্ত্ব হাজির করে উদ্বুদ্ধ করেন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক মাইরন ওয়েইনার। অধ্যাপকরূপে তিনি দীর্ঘদিন আসামে ও ভারতের অন্যত্র কাটিয়েছেন তাঁর বন্ধু আসামের রাজ্যপালের আতিথ্যে। তিনি তত্ত্ব খাড়া করেছেন ভারতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মানুষের প্রব্রজন (মাইগ্রেশন) কিছু কিছু জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিতে পারে। এর জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি আসামকে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে বহুজাতিক ভারতের ঐক্য অবাস্তব এবং মোটেই টেকসই নয়। তাই তিনি ভারতকে দ্বিনাগরিকত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের পৃথক নাগরিকত্বের স্বীকৃতির ব্যবস্থা থাকতে হবে সেখানে। এরই সাথে সমস্ত ভূমিপুত্রদের বিশেষ অধিকার দেবার কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত যে মার্কিন জাতি গড়ে উঠেছে ব্রিটেন সহ বহু দেশের মানুষের প্রব্রজন ও মিশ্রণে সেই মার্কিন জাতির একজন প্রব্রজন ও মিশ্রণের বিরুদ্ধে তত্ত্ব হাজির করে ভারতের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য যে অসৎ বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। মাইরনের এই তত্ত্বের সঙ্গে কার্ক পেট্রিকের ভারতকে 'বলকানাইজ' (ভেঙে টুকরো টুকরো করে বহু স্বাধীন দেশ গঠন) করার তত্ত্ব মিলিয়ে দেখলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জালটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অসমীয়া জাতিসত্তার আবেগকে উসকে দিতে ময়দানে হাজির হন আর এক ব্রিটিশ আমলা মুলান। ১৯৩১ সালে তিনি অসমীয়াভাষীদের অস্তিত্ব সংকট নিয়ে হুঁশিয়ার করেছিলেন। যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের জন্য বাইরে থেকে কয়েক লক্ষ চা শ্রমিক ও পাটচাষি এনেছিল সেই ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি হঠাৎ

করে অসমীয়া দরদি হয়ে ওঠার পেছনে রহস্য খুঁজে দেখা দরকার। মাইরন, কার্ক পেট্রিক, মুলানরা বহুজাতিক ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করে জাতি দাঙ্গা, গণহত্যা ও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের পথ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য আসাম আন্দোলনের নেতারা সেই পথটাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা যে বহুদিন আগে থেকে আসামসহ গোটা পূর্বাঞ্চলে শকুনের নজর রেখেছে সেটা কম-বেশি সকলের জানা। স্বাধীনতার প্রক্কালে এই অংশকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশ গড়ার দাবি তুলেছিলেন কুপল্যান্ড, গভর্নর রীড ও হাটন-এর মতো সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরা। পরবর্তীকালে চার্চের মাধ্যমে এই অঞ্চলে নাগা, মিজোসহ সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে পুষ্ট করে সাম্রাজ্যবাদীরা। এরাই সিকিম থেকে শুরু করে লুসাই পাহাড় আরাকান নিয়ে মঙ্গোলিয়ান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান কেন্দ্র আসামে তারা পায়ের নীচে শক্ত মাটি পায়নি।

আসাম আন্দোলনকে নিজেদের ছকে প্রভাবিত করার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদমাধ্যম, শিল্পী-সাহিত্যিক ও আমলাতন্ত্রের ভেতর যোগসূত্র গড়ে তোলে। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নানা সংগঠন ও সংযোগ গড়ে তোলে। শুধুমাত্র আসামেই ব্যাপক যোগাযোগ ও জন সম্পর্ক গড়ে তোলেনি, কেন্দ্রীয় স্তরেও গুরত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিশেষ সীমান্ত গোয়েন্দা সংস্থা (এস এস বি) আসাম আন্দোলনের গোপন দিকটায় বিশেষ করে সশস্ত্র করে তোলায় নানাভাবে সাহায্য করেছে। বিশিষ্ট জন এবং প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের মাধ্যমে বৌদ্ধিক প্রভাব বৃদ্ধির পাশাপাশি কখনো কখনো 'সাত বোন' (সেভেন সিস্টারস), 'প্রোজেক্ট ব্রহ্মপুত্র' ইত্যাদি প্রকল্প হাজির করে আন্দোলনকে আবেগঘন করার চেষ্টা হয়েছে। স্বপ্ন দেখানো হয়েছে 'আসাম যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের। ষড়যন্ত্র টের পাবার পর আসাম আন্দোলনের পিতৃপুরুষ স্বরূপ ও মূল তত্ত্বাকার শ্রীনিবারণ বরা দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে যান।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক, আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ আসামে বামপন্থী ও মার্কসবাদীরাই প্রধান বিপদ বলে বার বার রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সত্যকে গোপন করে বামপন্থীদের উত্থান ঠেকানোকে কেন্দ্র অগ্রাধিকার দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পর আসামেও বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের দিকে যাচ্ছে এমন দুঃসংবাদ মেনে নিতে পাচ্ছিল দেশের শাসকশ্রেণি। তাই দেশের ঐক্য

ও সংহতি বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে বামপন্থা ও মার্কসবাদ বিরোধিতার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জনমত গঠন ও জনভিত্তি স্থাপনের জন্য 'বিদেশি বিতাড়ন' স্লোগানকে প্রধান হাতিয়ার করেছে। অন্ধ আবেগ ব্রিটিশ আমলে আসা মুসলিম, আদিবাসীদেরও বিদেশি বলে বিতাড়নের দাবি তুলেছে। অথচ গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে আসা মুসলিমরা কখনোই নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার দাবি তোলেনি। তারা অসমীয়া মূল স্রোতে মিশে যেতে চেয়েছিল। ভাষা হিসেবে তারা অসমীয়াকে গ্রহণ করে। তাদের অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে একমাত্র অসমীয়াকে মেনে নেয়। এমনকি ১৯৫১ সাল থেকে প্রতিটি জনগণনায় এরা নিজেদের মাতৃভাষা অসমীয়া বলেই নথিভুক্ত করেছেন। তথাপি এই মুসলিমদের বিদেশি বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম উৎখাত ও বিতাড়িত হয়। পরে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে তাঁরা সকলে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের অস্বীকার

বিদেশি অনুপ্রবেশকারী ইস্যুকে সামনে রেখে আর এস এস-বি জে পি যেভাবে আগ্রাসী প্রচার চালাচ্ছে তাতে প্রধান টার্গেট হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারী বিদেশি বলে যাঁদের কথা বার বার বলা হচ্ছে তারা সকলেই বাংলাদেশি। এই তথাকথিত বিদেশিদের যদি তাড়াতে হয় তবে বাংলাদেশেই পাঠাতে হবে। আর এই জায়গাতেই বাংলাদেশের উদ্বেগ ও আপত্তি।

নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বিশেষ চুক্তির ফলে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই দু-দেশের লোক দু-দেশে যাতায়াত করতে পারে। ফলে এ দুই দেশ থেকে আগতরা বিদেশি হলেও তাদের তাড়াবার প্রশ্ন নেই। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি কোনো সীমান্ত নেই। তেমনি আফগানিস্তান থেকে অনুপ্রবেশের সমস্যাও কম। শ্রীলঙ্কা বা মালদ্বীপ থেকে আসতে হলে সমুদ্র পথে আসতে হয়। অবশ্য সেখানে অনুপ্রবেশের ঘটনা নেই বললেই চলে। চীনের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত থাকলেও চীন থেকে সাধারণভাবে ভারতে কোনো অনুপ্রবেশ হয় না। মায়ানমার থেকেও অনুপ্রবেশের ঘটনা কম। মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করলেও তারা যায় বাংলাদেশে। ভারতে উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশ সমস্যা বলে যা বলা হয় তা মূলত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে। দেশ ভাগের পর ভারত থেকে যেসব মুসলিমদের পাকিস্তানে

যাবার কথা তারা প্রায় সকলেই চলে গেছে। তেমনি পাকিস্তান থেকে যে হিন্দুরা ভারতে আসার তারাও প্রায় সকলে চলে আসে। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের (যারা মূলত পাঞ্জাবি) পূনর্বাসনের কাজও ভারত সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করেছে। এর ফলে পরবর্তীকালে ভারতে পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায়। ইদানীং পাকিস্তান থেকে জঙ্গী অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটলেও সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে না। তাই হিন্দুবাদীদের মুখে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীর কথা একেবারেই শোনা যায় না। তাদের মতে ভারতে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীরা সকলেই বাংলাদেশি।

দেশ ভাগের সময় দুই বাংলার মধ্যে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যাওয়া ও আসা সম্পূর্ণ হয়নি। হিন্দুদের বেশির ভাগ ভারতে চলে এলেও থেকে যায় অনেকে। তেমনি মুসলিমদেরও একটা বড় অংশ থেকে যায় ভারতে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির চাপে একে একে আরও অনেক হিন্দু ভারতে আসতে থাকেন ধারাবাহিকভাবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত এই ধারা অব্যহত থাকে। তা ছাড়া পাঞ্জাবে পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফলে পুনর্বাসনের প্রত্যাশা জেগে থাকে। সেই প্রত্যাশা আরও উদ্বাস্তু আসার সম্ভাবনা তৈরি করে। আবার দুই বঙ্গের মানুষের মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা থাকলেও ভাষা ও সাংস্কৃতিক মিল বিস্তর। তাই বাংলাভাষী বা বাঙালিদের মধ্যে একসঙ্গে বসবাসের ঐতিহাসিক বাস্তবতা আছে। এই ঐতিহাসিক ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ এবং অংশত আসামে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা ও অনুপ্রবেশের সমস্যা থেকেই যায়। স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রবেশ নিয়ে এখন যে হইচই হচ্ছে তা প্রধানত বাংলাদেশকে ঘিরেই।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যমন্ত্রী-নেতারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কথা বার বার উল্লেখ করছেন। আসামে এন আর সি-র মাধ্যমে বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তারাও বাংলাদেশ থেকে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আরএসএস-বিজেপি-র দাবি অনুযায়ী সারা দেশে নাকি কয়েক কোটি বাংলাদেশি ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে ২ কোটি পশ্চিমবঙ্গে। অনুপ্রবেশকারী বা চিহ্নিত বিদেশিরা যদি বাংলাদেশের হয় এবং তাদের যদি দেশ থেকে তাড়াতে হয় তাহলে বাংলাদেশেই তাদের পাঠাতে হবে। অমিত শাহ ও অন্য নেতারা প্রতিদিনই প্রায় হুঙ্কার ছাড়ছেন সমস্ত বিদেশিকে সীমান্তের ওপারে ছুঁড়ে ফেলা হবে। এনআরসি করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দু-কোটি মানুষকে তাড়ানো হবে।

এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতে কয়েক কোটি মানুষকে বিদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো মানে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাংলাদেশ তাদের উদ্বেগের কথা ভারতকে জানিয়েছে। এনআরসি তথা বিদেশি বিতাড়ন প্রশ্নে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে টানাপড়েন বাড়তে থাকলে সেই সুযোগে বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝোঁকার সম্ভাবনা আছে। তাই ইদানীং অনুপ্রবেশকারী বা বিদেশি তাড়ানোর প্রশ্নে বাংলাদেশের নাম যথাসম্ভব কম উল্লেখ করার কৌশল নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী ঢাকা গিয়ে উদ্বেগ প্রশমনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে অনুপ্রবেশ করেনি। ভারতে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক বেআইনিভাবে বসবাস করে না। অতএব ভারতের তথাকথিত বিদেশিদের বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় নিউইয়র্কে শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে বৈঠকের সময় বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। কিছুদিন পর শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় দিল্লিতে ফের বিষয়টি তুলেছিলেন হাসিনা। নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। ভারতের এই বক্তব্য বাংলাদেশের উদ্বেগ নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা যেভাবে বিদেশি তাড়ানোর প্রচার চালাচ্ছেন তাতে ভারতের বক্তব্য নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দু'দেশের সম্পর্কে অবিশ্বাসের ছায়া থেকে যাচ্ছে।

ভারতের বক্তব্য অনুযায়ী এনআরসি নিঃসন্দেহে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত বিদেশিরা যদি বাংলাদেশের হয় এবং তাদের যদি দেশ থেকে তাড়ানো হয় তাহলে তাদের বাংলাদেশেই যেতে হবে। তখন বিষয়টি আর অভ্যন্তরীণ থাকছে না। জড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশও। ভারত তাড়াবে। কিন্তু তারা যাবে কোথায়? বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না। জোর করে বাংলাদেশে পাঠাতে গেলে সংঘাত অনিবার্য। তাহলে অনুমান করা যায় চিহ্নিত বিদেশিদের তাড়ানো সম্ভব হবে না। ডিটেনশন কেন্দ্র বা অন্যভাবে তাদের ভারতেই থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। অর্থাৎ উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ উন্মাদনায় বিপুল সংখ্যক মানুষের যাবতীয় মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখা হবে আজীবন। এমন আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করেই আরএসএস-বিজেপি তাদের হিন্দু রাষ্ট্রের কর্মসূচি কার্যকর করার দিকে এগোতে চাইছে।

নরেন্দ্র মোদী তথা ভারতের আশ্বাস থেকে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এনআরসি আসলে একটি ধাপ্পা। আসল উদ্দেশ্য একে সামনে রেখে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনায় মানুষকে আবিষ্ট করে এবং মুসলিম বিতাড়নের ঢেউ তুলে হিন্দুদের রাজনৈতিকভাবে মেরুকরণের দিকে টেনে আনা। বৃহত্তর রাজনৈতিক মুনাফা পাবার জন্য আরএসএস-র পরিকল্পনা। তাতে বলির পাঁঠা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ গরিব, নিরক্ষর, আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ নিরীহ সরল মানুষ। এঁদের কেউ ধর্মীয়ভাবে হিন্দু, কেউ মুসলিম। আর অবশ্যই ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু। এই বিপুল অংশের মানুষকে পরিচিতিহীন, নাগরিকত্বহীন ও দেশহীন করে, তাদের অসহায়তা ও যন্ত্রণার বিনিময়ে ক্ষমতা পোক্ত করা।

হিন্দু নাগরিকত্ব

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন সারা দেশেই এনআরসি করা হবে। তাঁর যুক্তি গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র পক্ষে বিপুল জনসমর্থনের অর্থই হল মানুষ এনআরসি সমর্থন করছেন। আসামে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ায় এবং তাতে সংখ্যাগুরু অংশের নাম বেশি থাকায় নতুন বিতর্ক তৈরি হবার পরও অমিত শাহ্ তাঁর অবস্থান বদলাননি। তিনি ফের বলেছেন সারাদেশে এনআরসি হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে। নির্দিষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেছেন একজন বিদেশিকেও থাকতে দেওয়া হবে না। তিনি এটাও বলেছেন এটা 'ন্যাশানাল রেজিস্টার অব আসাম' নয়। 'ন্যাশানাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস'। অর্থাৎ এনআরসি সারা দেশের জন্য। অবশ্য তিনি এটা বলতে ভোলেননি যে আগে সংসদে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন হবে। তারপর হবে সারা দেশে এনআরসি।

অমিত শাহ-র এই বক্তব্য ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ও পুনরুচ্চারিত হচ্ছে সঙ্ঘ পরিবারের প্রায় সব মহল থেকেই। আসলে কথাগুলি অমিত শাহ-র নয়। হিন্দুত্ববাদের মূল ভাবনারই এটা অন্যতম অনুসঙ্গ। প্রস্তাবিত হিন্দুরাষ্ট্রের হিন্দু নাগরিকত্বের শর্ত মেনেই কেবলমাত্র হিন্দুদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পথে এগোচ্ছে মোদী সরকার। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধন বিলের যুগলবন্দিতে একাজটিকে তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব বিল তাদের কাছে হিন্দু নাগরিকদের বেছে নেবার ছাঁকনি। সারা দেশে এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা অনুযায়ী নাগরিকদের বাছাই করে বাকিদের অধিকার ও মর্যাদাহীন দ্বিতীয়

শ্রেণির নাগরিক করে রাখা হবে। আসামে এনআরসি করতে গিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেখানে প্রত্যাশা অনুযায়ী মুসলিমদের অধিক সংখ্যায় বাদ দেওয়া যায়নি। উল্টে হিন্দুরাই বেশি বাদ চলে গেছে। সংঘ পরিবার একে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা বলে অচিরেই তা কাটিয়ে ওঠার আশ্বাস দিচ্ছে এবং সারা দেশে এন আর সি করার ওপর জোর দিচ্ছে।

হিন্দু রাষ্ট্রের মৌলিক ভাবনায় নাগরিকত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হিন্দু রাষ্ট্রের নাগরিকদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। ১৯২১ সালে সাভারকার যে হিন্দুত্ববাদের সূচনা করেছেন তাতে এই দুই শর্তের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। একটি পিতৃভূমি। কোনো ব্যক্তির পিতৃপুরুষ যে ভৌগোলিক অঞ্চলে জন্মেছেন সেটাই তাঁর পিতৃভূমি। দ্বিতীয়টি দেবভূমি। কোনো ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারি সেই ধর্মের উৎসভূমি হল দেবভূমি। এই সূত্র অনুযায়ী বৈদিকবাদ, সনাতনবাদ, জৈন, বৌদ্ধ, লিঙ্গায়েত, শিখ, আর্য সমাজ, ব্রহ্ম সমাজ, দেব সমাজ, প্রার্থনা সমাজ-সহ অনুরূপ ধর্মমতগুলির উৎস 'হিন্দুস্থান' এবং এগুলি সবই হিন্দু ধর্মের শাখা বা অংশ। এই ধর্মাবলম্বীদের সকলেরই পিতৃভূমি ভারত। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি, পার্সিদের পিতৃভূমি ভারত হলেও তাদের হিন্দুস্থানি' বলে গণ্য করা হবে না। কারণ তাদের দেবভূমি অর্থাৎ ধর্মের উৎসভূমি 'হিন্দুস্থান' নয়। একইভাবে জাপানি চীনা-সহ অন্য অনেক দেশের মানুষ যাদের দেবভূমি ভারত হলেও (বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রে) পিতৃভূমি ভারত নয়।

হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাগরিকত্ব ভাবনার সামঞ্জস্য রেখেই নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব বিল-এর পরিকল্পনা। আপাতত পিতৃভূমি ও দেবভূমির শর্ত পুরোপুরি পূরণ না হলেও ধাপে ধাপে সেই দিকেই এগোতে চাইছে সরকার। তেমনি হিন্দুত্ববাদী ভাবনা থেকেই উঠে এসেছে জাতীয় ভাষার প্রসঙ্গটি যা কিছুদিন আগে অমিত শাহ সামনে এনেছেন। মোদী সরকার শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যেমন হিন্দিকে নির্দিষ্ট করতে চায় তেমনি একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবেও হিন্দিকেই ঘোষণা করতে চায়। হিন্দুত্ববাদের উদ্‌গাতা সাভারকারের মতে সংস্কৃত দেবভাষা। অর্থাৎ হিন্দু দেবতারা এই ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর মতে বিশ্বের যেকোনো ভাষার মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র সংস্কৃত। আর সংস্কৃত থেকেই জন্ম নিয়েছে হিন্দি ভাষা। তাই হিন্দিই জাতীয় ভাষা হবার উপযুক্ত। তবে হিন্দু জ্ঞানী-গুণী-প্রাজ্ঞ-বুদ্ধিজীবীদের ভাষা হবে সংস্কৃত। তারা সংস্কৃতেই যাবতীয় জ্ঞানচর্চা-গবেষণা করবেন। হিন্দি হবে আম হিন্দুদের ভাষা।

সাভারকারের হিন্দুত্ববাদী তত্ত্বের শতবর্ষ ২০২১-২২ সালে। তার আগেই সঙ্ঘপরিবার-এর যাবতীয় অভিমুখগুলি বাস্তবের আঙিনায় নিয়ে আসতে চায়।

কিন্তু তড়িঘড়ি তা করতে গিয়ে আসামে এনআরসি এবং অন্যত্র হিন্দি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। অবশ্য হিন্দুত্ববাদীরা মনে করছে এই বাধা ভেঙে তারা হিন্দুত্ববাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হিন্দুত্ববাদের একটি অন্যতম স্লোগান 'আগে মুসলিম পরে খ্রিস্টান'। অর্থাৎ আগে মুসলিমদের হটাও তারপর খ্রিস্টানদের। মোদী সরকার সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখার সক্রিয় সহায়তায় সব রাজ্যে মুসলিমদের প্রান্তিকীকরণ ও কোণঠাসা করার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যদিও এনআরসি-র প্রাথমিক লক্ষ্য বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্য আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূল করা কিন্তু নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পর সারা দেশে এনআরসি করার ঘোষণা থেকে পরিষ্কার এর আসল লক্ষ্য বাংলা বা আসামের অবৈধ মুসলিম নয়, দেশের যেকোনো জায়গায় বসবাসকারী সকল মুসলিমকেই হুমকি দেওয়া। সঙ্ঘ পরিবার তাদের মুসলিম প্রান্তিকীকরণের প্রকল্পকে এনআরসি এবং নাগরিকত্ব আইন দিয়ে আইনি ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটাতে চাইছে। আগে এই কাজটিই হচ্ছিল গো রক্ষার নামে পিটিয়ে হত্যা। লাভ জিহাদের নামে হামলা, অপমান-কটুকথা-দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রস্ত করা, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর মধ্য দিয়ে। এবার সেই কাজকেই আইনি বিধিবদ্ধতার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী

হিন্দু রাষ্ট্রের হিন্দু নাগরিকত্বের শর্তগুলি মাথায় রেখে মোদী সরকার নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে গোড়াতেই। ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই সেই সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশ করা হয়। কিন্তু বিলটি নিয়ে বিরোধীদের বিস্তর আপত্তি ও দ্বিমত থাকায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য ওই বছরই গঠন করা হয় যৌথ সংসদীয় কমিটি। বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এ বছর ৮ জানুয়ারি বিলটি লোকসভায় পাশ হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় তা পেশ করা হয়নি। এই বিল নিয়ে এমনিতেই বিরোধীদের আপত্তি আছে। আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এই বিলের সমর্থক নয়। এই অবস্থায় সামনে লোকসভা নির্বাচন থাকায় সরকার ঝুঁকি নিয়ে বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করেনি। ইতিমধ্যে নতুন সংসদ গঠন হয়েছে। ফলে নতুন করে ফের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ করাতে হবে। এখন অবশ্য রাজ্যসভায়ও শাসক জোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে। ফলে বিল পাশের কোনো অসুবিধা নেই।

এই নাগরিকত্ব বিলটি পুরোপুরি সংকীর্ণ, বৈষম্যমূলক এবং সংবিধানের মৌলিক ভাবনার বিরোধী। এতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞাটাই বদলে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শর্ত যুক্ত হচ্ছে। তেমনি প্রতিবেশী দেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে আসা মানুষদের ধর্মের ভিত্তিতে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু তাদের শরণার্থী বলে গণ্য করা হবে আর মুসলিমদের বলা হবে অনুপ্রবেশকারী। দুই ক্ষেত্রে দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বলা হয়েছে প্রতিবেশী মুসলিম অধ্যুষিত তিন দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দুরা আসবেন তাঁদের বলা হবে শরণার্থী। হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ও পার্সিদেরও। অর্থাৎ এরাও শরণার্থী হিসেবে গণ্য হবে। এদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অন্যরা অর্থাৎ মুসলিমদের বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে তাড়ানো হবে।

বিল অনুযায়ী তিন দেশ থেকে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব হিন্দুরা আসবেন তাঁরা আইন মোতাবেক নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। কিন্তু মুসলিমরা সেই সুযোগ পাবেন না। আসামের এনআরসি-তে বিপুল সংখ্যক হিন্দু বাদ যাওয়ায় সেখানে বিজেপি বেকায়দায় পড়ে। যে হিন্দুরা গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে ঢেলে ভোট দিয়েছে তারাই তালিকা থেকে বাদ পড়ায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে।

একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করে ২ কোটি বিদেশি তাড়ানোর কথা বার বার হুঙ্কার দিয়ে ঘোষণা করায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। আসামের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলার মানুষ উপলব্ধি করছেন তাদের ভবিষ্যত কি ইঙ্গিত করছে। এই অবস্থায় বিজেপি বিরোধী ক্ষোভের আগুন বাংলায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন বিলীন হবার ভয়ে তড়িঘড়ি নাগরিকত্ব বিলকে সামনে তুলে ধরছে। বলতে চাইছে এনআরসি হলেও হিন্দুদের কোনো ভয় নেই। হিন্দু যারা বাদ যাবে তাদের সকলে নাগরিক হয়ে যাবে। বাদ যাবে শুধু মুসলিমরা। ঘটনা যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে আসামে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে নাগরিকত্ব বিল পাশ করানো হল না কেন? বিল পাশ করে যদি হিন্দুদের নাগরিক করা হবে তাহলে আসামে বাদ যাওয়া হিন্দুদের ট্রাইব্যুনালে দৌড় করাচ্ছে কেন?

বলা হচ্ছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান-বাংলাশে থেকে অমুসলিমরা নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ভারতে এলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তারা যে নির্যাতিত হয়ে এসেছে তার প্রমাণপত্র দেবে কে? তেমনি ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর যে

হিন্দুরা নির্যাতিত হয়ে ভারতে আসবে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না কেন? তাদের কি তাড়িয়ে দেওয়া হবে? না ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হবে? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেভাবে ধর্মের নামে বিভাজন করে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের নাগরিকত্ব দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে তা সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সংবিধানের ১৪ ধারার সমতার মৌলিক অধিকার বিরোধী। ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হচ্ছে। কিছু মানুষকে রাখা হচ্ছে বাকিদের বাতিল করা হচ্ছে।

প্রশ্ন আছে উত্তর নেই

এনআরসি-কে কেন্দ্র করে অনেকগুলি গুরুতর প্রশ্ন সামনে এসেছে। তার কোনো সদুত্তর মিলছে না।

১। ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তি অনুযায়ী আসামে এনআরসি হচ্ছে। সেই চুক্তিতে সারা দেশে এনআরসি-র কোনো কথা নেই। তাহলে সারা দেশে এনআরসি-র প্রসঙ্গ উঠছে কেন? তা ছাড়া আসামে প্রথম এনআরসি হয় ১৯৫১ সালে। পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা আপডেট বা সময়োপযোগী করার কথা। অর্থাৎ এখন যে এনআরসি হচ্ছে সেটা আসলে আপডেট হবার কথা।

২। এনআরসি আবেদন ভিত্তিক ব্যবস্থা। দেশের সব অধিবাসীকেই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। তার মানে বর্তমানে দেশে একজনও নাগরিক নেই। নাগরিক হবার জন্য তাদের সকলকে আবেদন জানাতে হবে। তবে কি স্বাধীনতার পর ৭০ বছর ধরে ভারত নামক দেশে একজনও নাগরিক ছিল না? নাগরিকহীনভাবেই ৭০ বছর একটা দেশ চলেছে। যদি এতদিন নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হত তাহলে নতুন করে নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রশ্ন থাকে না। সকলকে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদন করতে বলার অর্থ তাঁরা নাগরিক নন। তবে কি এতদিন অনাগরিকরাই ভোট দিয়ে সরকার গঠন করত, সরকারি সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত? এমন আজব কাণ্ড সম্ভবত ভারতেই সম্ভব।

৩। আসামে ১৯ লক্ষ বাংলাদেশি চিহ্নিত। পশ্চিমবঙ্গে নাকি ২ কোটি বাংলাদেশি আছে। সারা দেশে আরও বেশ কয়েক লক্ষ হবে। এঁদের নাকি তাড়ানো হবে। কোথায় তাড়ানো হবে? বাংলাদেশ নেবে না। তাহলে যাবে কোথায়? তাদের ভবিষ্যৎ কি? উত্তর নেই।

৪। আসামে ডিটেনশন কেন্দ্রে আপাতত ৯ হাজার জনের থাকার ব্যবস্থা। বাকি ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজারকে কোথায় রাখা হবে? এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কাউকে

৩ বছরের বেশি আটক রাখা যাবে না। ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে কিভাবে ছাড়া হবে? ছাড়ার পর তাঁরা কি করবেন? চিহ্নিত বিদেশিদের জমিজমা, বাড়িঘর, অর্থ-সম্পদ কারা ভোগ করবে?

৫। প্রথমে ট্রাইবুনাল, তারপর হাইকোর্ট, শেষে সুপ্রিম কোর্ট। বিচার পর্ব শেষ করতে কত বছর সময় লাগবে কেউ জানে না। ততদিন বাতিলদের অবস্থান কি হবে? যে গতিতে ভারতে মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং যে বিপুল সংখ্যক মামলা বকেয়া আছে তাতে শুধু আসামের বিদেশি নিশ্চিত করতে এক দশক সময় লেগে যাতে পারে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে এন আর সি হলে তার ধাক্কা সামলাতে আরও কয়েক দশক কেটে যাবে।

৬। সারা দেশে দাবি অনুযায়ী যদি দু কোটি বাংলাদেশি চিহ্নিত হয় তাহলে তাদের ডিটেনশন সেন্টারের রেখে ন্যূনতম প্রয়োজনের জোগান দিতে সরকারকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। অর্থ সঙ্কটের সময় এই বাড়তি দায় বহন করা সরকারের পক্ষে কতটা সম্ভব?

এমন উত্তরহীন প্রশ্ন আরও অনেক আছে। বোঝা যাচ্ছে সরকার চলছে বিভ্রান্তি আর উদ্বেগের ঘোলা জলে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে।

আসামে উস্‌কানি

শাসক বিজেপি উস্‌কানি দিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। আসাম বিজেপি-র প্রভাবশালী নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রকাশ্যে মুসলিম বিরোধী মন্তব্য করছেন। 'রাজ্যে যেসব ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে সেখানে মুসলিমদের ঢোকানো হবে'। কেননা নভেম্বর মাসে নাগরিকত্ব বিল পাশ হলে বাদ পড়া হিন্দুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। মুসলিমদের ক্যাম্পে রাখা হবে আমৃত্যু। নাগরিকত্ব বিল পাশের পর ফের এনআরসি হবে হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। হিমন্তের কথা যদি সত্য হয় তাহলে বাদ যাওয়া হিন্দুদের ফরেনার্স ট্রাইবুনালে পাঠানো হচ্ছে কেন? তা ছাড়া কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাঁচ বছর ধরে এনআরসি-র কি প্রয়োজন ছিল? একেবারে নাগরিকত্ব বিল পাশ করিয়ে এনআরসি করলেই হত। এদিকে এনআরসি-কে সঠিক বলছেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রক থেকে বিবৃতি দিয়ে তালিকা যথাযথ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ দেখানো হলেও আসল লক্ষ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির আড়ালে বিভাজন জোরালো করা।

এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরই বিশ্বশর্মা বলেছেন হিন্দুদের নাম

বেশি বাদ পড়েছে। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করবে। যদিও তা করেনি। ডিটেনশন ক্যাম্পে শুধুমাত্র মুসলিম রাখার কোনো আইন নেই। বর্তমানে রাজ্যে যে ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্প আছে তাতে মাত্র ১১০০ 'বিদেশি' আটক আছে। তারা ভাষিক সংখ্যালঘু (বাঙালি)। এদের ৯০ শতাংশই হিন্দু। বিজেপি যদি মুসলিমদেরই বন্দি রাখতে চায় তাহলে এই হিন্দুরা বছরের পর বছর বন্দি আছে কেন? এই অমানবিক ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে সিপিআই(এম) আসাম রাজ্য কমিটি। মানবাধিকার কর্মী হর্ষ মান্দার এই ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। সেই মামলায় পর্যবেক্ষণে কোর্ট বলেছে কোনো ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন আটকে রাখা যাবে না। তিনি যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হন তাহলে তাকে তার দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। নাহলে ছেড়ে দিতে হবে।

মোদী সরকার তথাকথিত বিদেশিদের প্রত্যর্পণ করছে না। আবার ছেড়ে দেবার কথা বললেও কঠিন শর্ত আরোপ করছে। শর্ত হল তিন বছর বন্দিজীবন কাটানোর পর ছাড়া হবে তবে বন্দি ২ লক্ষ টাকা জামানত রাখতে হবে ও দুজন প্রকৃত ভারতীয়কে জামিনদার হতে হবে। একজন কপর্দকহীন ঘোষিত বিদেশি কোথা থেকে ২ লক্ষ টাকা দেবে? কোন ভারতীয় আটক বিদেশির জামিনদার হতে যাবে? কিন্তু কোথাও বলা হয়নি হিন্দু বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হবে। মুসলিম বন্দিদের ছাড়া হবে শর্তসাপেক্ষে। সংবিধানের চোখে যে সবাই সমান।

ষড়যন্ত্রের আড়ালে

এনআরসি-কে (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) কেন্দ্র করে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে গরিব এবং স্বল্প বা অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে প্রবল ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরএসএস-বিজেপি-র নেতারা যেভাবে প্রতিদিন অন্য রাজ্যে তথা সারা দেশে এনআরসি করার হুমকি দিচ্ছেন প্রায় প্রতিদিন তাতে সর্বস্তরে আতঙ্ক আরও তীব্র আকার দিচ্ছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি তৈরির ঘোষণা। সরকার ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আগামী বছর থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভারতে বসবাসকারীদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হবে। একাজ চলবে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। আতঙ্ক তৈরির তৃতীয় পদক্ষেপ ভোটার তালিকা যাচাইয়ের নতুন নির্দেশ। এই নির্দেশকে ঘিরে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে বেছে বেছে গরিব ও একটা বিশেষ অংশের মানুষকে কৌশলে তালিকা থেকে বাদ

দেবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব বিল পাশ করিয়ে ভারতে বসবাসকারী তথা পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত সমস্ত অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেবার ব্যবস্থা হবে। অর্থাৎ বেছে বেছে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিদেশি চিহ্নিত করে বিতাড়নের ব্যবস্থা হবে। সব মিলিয়ে সারা দেশে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মুখে মানুষের অসহায়তা প্রকট আকার ধারণ করেছে। নানা দিক থেকে আক্রমণের জাল বিস্তার করে সরকার সাধারণ মানুষকে এক ভয়াবহ অস্তিত্বের সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছে যাতে এর থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা বিভাজনের শিকার হয়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতি আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতি কতটা প্রকট আকার ধারণ করেছে তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, সম্প্রতি এরাজ্যে রেশন কার্ড তৈরির জন্য ক্রমবর্ধমান লাইন। রেশন কার্ডের সঙ্গে নাগরিকত্ব বা এনআরসি-র আপাত কোনো সম্পর্ক না থাকলেও মানুষ তাদের আত্মপরিচয় প্রমাণের জন্য অন্তত একটি বাড়তি সরকারি পরিচয়পত্র পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের সর্বত্র প্রতিদিন লাইনে দাঁড়াচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। যারা রেশন তোলেন না তারাও সব লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক নিদারুণ অস্তিত্বের সঙ্কটের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে ঠেলে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী শাসকশ্রেণি।

আসামের নাগরিক পঞ্জিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় শাসকদল এবং তাদের সহযোগীদের প্রচার থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার নির্ভুল নাগরিক পঞ্জি তৈরি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। বরং তাদের লক্ষ্য বেছে বেছে গরিব, নিরক্ষর, পিছিয়ে পড়া অংশ এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের যথাসম্ভব ছেঁটে ফেলে তাদের কপালে বিদেশি তকমা সেঁটে দেওয়া। আসামে নাগরিক পঞ্জি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বিপুল সংখ্যক অমুসলিম মানুষও বাদ পড়ে গেছে। আসলে যে নথিপত্রের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব যাচাই করা হচ্ছে সেইসব অর্ধশতবর্ষের পুরোনো কাগজপত্র রক্ষা করার বাস্তবতা গরিব, নিরক্ষর, পশ্চাদপদ ও ভূমিহীন ঝুপড়িবাসী-ফুটপাতবাসী মানুষের নেই। তা ছাড়া স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষকে তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু কাগজ সযত্নে রক্ষা করতে হবে এমন ভাবনা মানুষের কল্পনাতেও ছিল না। তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গরিব মানুষগুলিই সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন।

আসামে নাগরিক পঞ্জিকে ঘিরে মানুষের এই বিপদ, এই আতঙ্ক, এই ভবিষ্যৎ

অনিশ্চয়তাকে পুঁজি করে মোদী-শাহরা সারা দেশে এনআরসি-র জিগির তুলে ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে। এই ত্রাসের মধ্যে মানুষকে সহজে ভাগ করে তাদের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে ভোট ব্যাঙ্ককে সংহত করতে চাইছে। এনআরসি-র মাধ্যমে বাদ যাওয়া হিন্দুদের আশ্বস্ত করতে টোপ দেওয়া হচ্ছে আগামী শীতকালীন অধিবেশনেই নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করে সব হিন্দুদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অর্থাৎ সংবিধানকে উপেক্ষা করে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিক নির্ধারণের কথা বলা হচ্ছে।

এনআরসি নিয়ে চরম আতঙ্কের মধ্যে শুরু করা হচ্ছে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি। ২০২১ সালে জনগণনার সময় ভারতে বসবাসকারীদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জনগণনার ব্যবস্থা থাকার পর কেন যে জনসংখ্যা পঞ্জি দরকার তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনো মেলেনি। বস্তুত ২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় এই জনসংখ্যা পঞ্জি তৈরির কাজ শুরু হয়। এর জন্য সেই সময় নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হয়। ইউপিএ সরকারের সময় এই কাজ বাতিল হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে আধার চালু হবার পর তা পরিত্যক্ত হয় এই যুক্তিতে যে একই কাজ দু-বার করা অর্থহীন। অথচ মোদী সরকার বিস্ময়করভাবে তা ফের চালু করার নির্দেশ জারি করেছে। অনুমান করা হচ্ছে আগে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি তৈরি করে পরে তার ভিত্তিতে সারা দেশে এনআরসি তৈরি করা হতে পারে।

এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন চালু করেছে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের নতুন পদ্ধতি। মোবাইলে ফোনের মাধ্যমে অনলাইনে তালিকায় নিজের নাম যাচাই করতে হবে ভোটারকেই। নির্বাচন কমিশন এই দায়িত্ব ভোটারদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। গরিব, নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ প্রান্তিক এলাকার মানুষের পক্ষে একাজ একরকম দুঃসাধ্য। ভোটার কার্ড থাকা ও তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও এই জটিল প্রক্রিয়ায় মানুষকে যেতে বাধ্য করার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারণা গরিব তথা একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষকে তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলার ষড়যন্ত্র থাকলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

সারা দেশে এনআরসি, জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি, ভোটার তালিকায় নাম যাচাইয়ের নতুন নির্দেশ এবং নাগরিকত্ব বিল সংশোধনের উদ্যোগ এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। আরএসএস-বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মেরুকরণের এক সুসংহত প্রকল্প। এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হতে চলেছে 'মাল্টিপারপাস কার্ড'।

বর্তমান চালু বিভিন্ন কার্ডের তথ্য এক জায়গায় করে একটি স্বতন্ত্র কার্ড তৈরির কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রথমে রেশন কার্ড, পরে ভোটার কার্ড, তারপর আধার কার্ড। এ ছাড়া আছে প্যান কার্ড। একটার পর একটা কার্ডের জন্য লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে চূড়ান্ত হয়রানির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি কার্ড করা, সংশোধন করা ও পুনর্নবীকরণ করার সময় পালন করতে হয় নানা শর্ত এবং দেখাতে হয় নানা নথিপত্র। এইভাবে বার বার একটার পর একটা পরীক্ষায় জোর বসিয়ে সরকার চাইছে প্রতিটি ধাপে কিছু কিছু করে ছাঁটাই করে ফেলতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মানুষকে দুঃশ্চিন্তার গহ্বরে ঠেলে দিয়ে মানুষের মূল সমস্যা রুটি-রুজির লড়াই থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।